খণ্ড ১৩, সংখ্যা ১৫ | ভাবনগর | জুন ২০২১
Vol. 13, No. 15 | BHĀBANAGARA | June 2021

‘অর্থলোভী লায়েক যারা’ - প্রেম কি সর্বজয়ী: লালনপন্থা সম্পর্কে একটি মতামত

দেবোরাহ্ এলিয়েত কুকিয়েরম্যান

কুষ্টিয়ার প্রাগপুরে নিজসাধনগৃহে সাধিকা দেবোরাহ

All-Conquering Love and the Path of Lalon

Deborah Eliette Cukierman

Abstract

In this unusual essay drawing on the textual analysis of some songs by Fakir Lalon Shah, on the philosophy of ashtanga yoga and on personal experience spanning many religious traditions, Deborah Zannat (Deborah Eliette Cukierman) tackles one of the most mysterious and most talked-about topics of all times: love. What love can be, what love can do, how to find it, keep it, give it and take it, are some of the questions that flow throughout this exploration. Looking at love from three points of view, that of a negative, of a positive and of a zero, Deborah Zannat argues that true love is divine yet within human endeavor. That cultivating love requires strong discipline and restraint, which she names the taming of the mind, related to the negative, to subtraction; it also requires positive acts of caring, that love is what love does, as Lalon Shah highlighted the five qualities of love according to Sri Chaitanya, related to addition. And most difficult of all, located in the dangerous fertility of the zero, the necessity of baring the mind to settle in peaceful, selfless, true and constructive acts of love - and this does not occur without struggle and resistance, without alluring traps and great risks. While Sufis claim to be the only path of love, Deborah Zannat here shows that any complete mystical boon necessarily yields love, whichever path may have been walked to acquire it. And that this pure divine love is human's highest achievement.

প্রেম। পিরিত। ভালোবাসা। এই পৃথিবীটিতে খুঁজে একজনকে পাওয়া মুস্কিল যে এই বহুনামী জিনিস নেওয়ার আশা রাখে না। তার বর্ণনা একাধিক। তার গল্প সাহিত্য-শিল্পে ভরা। প্রাচীন ল্যাটিন থেকে, কবি ভির্জিলের কথায়, "omnia vincit amor", ইংরেজিতে "Love conquers all", অর্থাৎ প্রেম সর্বজয়ী... এমন একটা বিশ্বাস যে যুগে যুগে মানুষ এর প্রমাণ খুঁজে থাকে হতাশাদায়ক বাস্তবে। তার পিঠে আর একটা আকাঙ্ক্ষা: সত্য কখনো চাপা থাকে না। এই কথার অন্য একটা রূপ *ইঞ্জিল*-এর মধ্যে পাওয়া যায়: Good always triumphs over Evil, অর্থাৎ নিকৃষ্টতা চাপিয়ে উৎকৃষ্টতার জয় অনিবার্য। এখানে বুঝা যাচ্ছে এই প্রশ্নটি কেন্দ্র করা লাগবেই: সত্য বা ভালো কাকে বলে? এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টায়, লালন সাঁইজির কিছু ধারণা তুলতে যাচ্ছি এই প্রবন্ধে। এর মধ্যে যোগদর্শন থেকে প্রেরণা পেয়ে, আমার ব্যক্তিগত মতামত বা জীবন দর্শন প্রকাশ করা হবে, বিনয় করে। এই 'আমি' থেকে কথা বলাটার পিছনে যুক্তিকর একটি কারণ। কারণটি হচ্ছে কেউ তার নিজ ধারণা থেকে বেশি দূরে যেতে অক্ষম, মানে যা যা কিছু প্রকাশ করা হয় একজনের উৎসে, তার মধ্যে কোন নৈর্ব্যক্তিকতা পাওয়ার সম্ভব নয়, বিজ্ঞানে বলুক আর শিল্প বলুক। তাই এই ব্যর্থতা স্বীকার করে, সব ভুলত্রুটি নিজের দায়িত্বে রেখে, এই প্রবন্ধের সম্বন্ধে ঢুকি।

প্রেম বিষয়টি রহস্যময় বটে, এবং সকলের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। এমন একটা দাবির বিরুদ্ধে দাঁড়ান প্রায় অসম্ভব। কেননা, একদিকে লালন সাঁইজির বাণীতে বলা হয়েছে—'পিরিতি অমূল্য নিধি / বিশেষ বিশ্বাস মতে কার হয় যদি', আর অন্যদিকে বলা হয়েছে—'প্রেম নাই যার চিতে, তেমনি কষ্টে সে (শুদ্ধ প্রেম না দিলে, ভজে কে তারে পায়)'। মার্কিন বুদ্ধ ধারায় একটি ধ্যানের চর্চা থাকে, যার নাম মৈত্রী ধারণা। এই চর্চায় চার জনের উদ্দেশ্যে প্রেম বোধ তৈরি করতে হয় মনে মনে, একটা পর একটা: যার সাথে খারাপ (যা খারাপ হোক না কেন) একটা সম্পর্ক থাকে, যার সাথে উদাসীন বা ভাবহীন একটা সম্পর্ক থাকে, যার সাথে ভালো একটা সম্পর্ক থাকে, ও নিজের সাথে। শেষ বেলায় প্রেম বোধটা বাড়াতে হয় চরাচরের প্রতি। এই সূত্রে রীতিনীতির উপদেশ ধরে অদ্ভুত একটি সংখ্যা পালন করব: -১ (নেগেটিভ এক), ০ (শূন্য), এবং +১ (পজিটিভ এক)। শুরু থেকে একটু হাল্কা বিশ্লেষণে গিয়ে দেখব যে, 'নেগেটিভ এক'

হচ্ছে বিয়োগ বা নিষেধাজ্ঞা, 'পজিটিভ এক' হচ্ছে যোগ বা শুদ্ধ কাজকর্ম, এবং 'শূন্যতা' মানে স্বভাবের স্থিরতা বা জ্ঞান-বিবেকের স্থিতি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যেমন সুস্বাস্থ্যকে বর্ণনা করে দিয়েছে শুধু একটি আরোগ্য অবস্থা নয়, তেমন প্রেম-ভালোবাসা-পিরিত শুধু একটি অনাক্রমণাত্মক সম্পর্ক নয়। নিরানন্দের অভাবে প্রেম ঘটে না; নিত্যানন্দ প্রেমের আর একটা নাম।

ক. 'নেগেটিভ এক' : 'সত্য কথায় কেউ নাই রাজি, সব দেখি তা না না না'

প্রবাদ-বাক্যের ভাষায়, নিজের জিনিস সকলেই ভালো দেখে। স্বাভাবিক আত্মসম্মান থাকলে, বেশির ভাগ মানুষের ভাল-মন্দের জ্ঞান থাকে, নিজেকে ভালো মনে করতে চায়, এবং চায় অন্য কেউ তাদের ভালো ভাবুক। এই আশাতে মিছে আছে অপ্রকাশিত অবচেতনায় নানান টান বা ধারা ও বাধা, যাদের প্রকাশ ও সংশোধন করা আধ্যাত্মিক সাধনার একটা উদ্দেশ্য। এই সংশোধনকে প্রাথমিক মুক্তি বলে। বুদ্ধ ধর্মের প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অরেগন বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Oregon) মনোবিজ্ঞানী উল্‌রিক ম্যায়র (Dr. Ulrich Mayr) একটি গবেষণা চালিয়েছিলেন উপকারি আচরণের উপরে। তাঁর প্রশ্ন ছিল: ভালো কাজে ব্যক্তিগত কী লাভ আছে? দেখা গেল ভালো কাজে মস্তিষ্কের রসায়ণ সুস্থ থাকে, তাতে শরীরেও অবশ্যম্ভাবী জীবন তুফানের চাপ কম পড়ে। সে বিষয় নিয়ে স্পষ্টভাবে ধরার চেষ্টা করব পরবর্তী অংশে, 'পজিটিভ এক' নামে। এই ভাগের নাম রেখেছি 'নেগেটিভ এক', লালন সাঁইজির সমকাল একই এলাকার সাধক গোঁসাই গোপালের উক্তি দিয়ে ('জাত গেলো, জাত গেলো বলে')। তার কারণ সহজ: প্রাথমিকভাবে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বার্থে কোনো সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। যেমন: 'প্রেম করা মুখের কথা, আত্মসুখের আশা থাকিতে হবে নারে তা' বা 'একদিন পরের কথা ভাবলি না রে, পার হবি হীরের সাঁকো কেমন করে'। ব্যক্তিস্বার্থ কুকর্মের মূল উপাদান, এর প্রমাণ অসাধারণ কিছুই নয়। কিন্তু কয়জন আসলে মানে? যদিও কারো কুকর্ম থেকে দূরে থাকার ইচ্ছা জাগে পাপের বা শাস্তির ভয়ে। ধ্বনিটি বিস্ময়জনক:

> রোগ বাড়ালি কুপথ্য করে।
> ঔষধ খেয়ে অপযশটি করলি কবিরাজেরে॥
>
> মানলে কবিরাজের বাক্য
> তবে তো রোগ হত আরোগ্য।
> মধ্যে মধ্যে নিজে বিজ্ঞ
> হয়ে রোগ বাড়ালি রে॥
>
> অমৃত ঔষধ খেলি
> তবে তো না মুক্তি পেলি।

লোভ লালসে ভুলে রইলি
ধিক তোমার লালসে রে॥

লোভে পাপ, পাপে মরণ,
তাও কি জান না রে মন।
লালন বলে, যা যা এখন
মর গা রে ঘোর বিকারে॥

পাতঞ্জলের যোগদর্শনে সাধনার আটটা ক্রমের (অষ্টাঙ্গ) একটি তালিকা ও বর্ণনা দেওয়া আছে, ২৯শ সূত্র থেকে। য়ম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই আটটা ধাপকে অষ্টাঙ্গ যোগ বুঝায়। প্রথম ধাপটির নিকটে ধরলাম, য়ম নামেঃ অহিংসা, সত্য, আস্তেয়, ব্রহ্মচার্য্য, অপরিগ্রহ। আমার মনে পড়ে এই অষ্টাঙ্গ যোগদর্শনের একটি ফরাসি অনুবাদ, যেখানে লেখা ছিল ঐ পাঁচটি য়ম জাতি, দেশ ও কাল মানে না, অর্থাৎ সর্বকালে সর্বস্থানে উপযুক্ত ও প্রযোজ্য। বলা যাবে এগুলো সমাজের সভ্যতার স্থূল ভিত্তি। আসলে আজব বিষয় যে একেশ্বর বা অ্যাব্রাহামিক ধর্মের পাপপুণ্য জ্ঞানের সাথে মিল দেখে দেয়। যেমন আসমানী-কিতাবে মুসা নবির প্রাতিষ্ঠানিক ১০টা উপদেশ ও খ্রিষ্টান ধারায় যে সাতটা মারাত্মক পাপ (অহংকার, লোভ, ক্রোধ, কাম, ঈর্ষা, আলস্য ও অতিভোজন)। আবার, হয়তো অত আজব নয় যেহেতু একই সংস্কৃতিতে তৈরি, এই পাঁচটি য়ম সরাসরি ষড়রিপুর বিপরীতে কার্যকরঃ অহিংসা ক্রোধে, সত্য মদে, আস্তেয় লোভে, ব্রহ্মচার্য্য কামে, ও অপরিগ্রহ মাৎসর্যে। মোহ থেকে পূর্ণমুক্তি লাভ করা সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য, সেটা যোগদর্শনে নিয়মের বিপরীতে পাওয়া যাবে। তুলনার জন্যে পাঁচটা নিয়ম উল্লেখ করলামঃ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রাণিধান। এই পাঁচটির নাম পড়লে, পাঠক বুঝতে পারবেন যে য়ম কতটুকু সম্পর্কে জড়িত, ও নিয়ম কতটুকু আত্মকেন্দ্রিক। যেহেতু প্রেম গঠন করার জন্য দুইটা নির্দিষ্ট পক্ষ লাগে, সেইহেতু আপাতত য়মের সমন্ধে ফিরলাম। পাঁচটি নিয়ম আবার ধরব এই প্রবন্ধের শেষ অংশে, শূন্যতা নিয়ে।

মনের বিকাশের মূল বাধা ষড়রিপু। লালন সাঁইজি এই ষড়রিপুকে অনেক বড় একটি স্থান দিয়েছেন তাঁর সাধনায়।প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নানান পরিভাষায়। তাদের 'ছয় জনা' বলে ডেকে 'দক্ষ চোর' বানিয়েছেন ('দিল দবিয়ার মাঝে দেখলাম আজব কারখানা')।দশ ইন্দ্রিয়ের (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক; পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের নাম হস্ত, পদ, গুহ্য, লিঙ্গ, মুখ) সঙ্গে হিসাব করে, ষোল জনা বোম্বেটের ফাঁদ বা লুটের সতর্ক করেছেন ভক্তদের। এই ষোল বোম্বেটে মেনে নেওয়া যায় যে আসলে মনের একটি সহজ বর্ণনা। আবার এই মনের কুকর্ম বার বার উল্লেখ করেছেন, যেমন 'ফকির লালন বলে মন তুই আমায় করলি রে দোষী (গুরু আমারে কি রাখবেন তোমার চরণ দাসী)', 'মনের হল মতি মন্দ, তাইতে হয়ে রইলাম আমি জন্ম-অন্ধ' বা 'মনেরে বুঝাতে আমার হল দিন আখেরি'।

একটি উপদেশ পাওয়া যায়, যার নাম দেওয়া হল ১৭তম শতাব্দীতে যুক্তরাজ্যে, খ্রিষ্টান ভাবুকদের কলমে: Golden Rule, মানে স্বর্ণনির্মিত আইন। তার একটা রূপ হচ্ছে 'do not do unto others what you do not wish to be done unto you', অর্থাৎ এমন ব্যবহার অন্যের সাথে করিওনা যে ব্যবহার তুমি কারো কাছ থেকে পেতে চাও না। ধর্মের নামে যে সব উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যদি মেনে চলা যায় যে এসবগুলোর উদ্দেশ্য মানব জীবনের ও মানব সমাজের উর্ধ্ব গতি ব্যবস্থা, তাহলে বোঝা যায় এই স্বর্ণনির্মিত আইন ধর্মের প্রতিষ্ঠান। একটা গল্প শুনেছি ছোটকালে। প্রাচীন যুগে, জ্যেষ্ঠ হিল্লেল (Hillel the Elder) নামে একজন ইহুদি মহাজ্ঞানী রাব্বি ছিলেন। একদিন তাঁর সামনে একজন পৌত্তলিক হাজির হল। অনুরাগে তার গাটা ঘেমে যাচ্ছিল, তবে সাহস করে সে রাব্বিকে একটি আহ্বান শুনাল: 'তোমার ধর্ম কী, বোঝাও আমাকে। কিন্তু যতক্ষণ আমি একটা পা তুলে অন্য পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, ততক্ষণ সময় দিচ্ছি তোমাকে'। তবে তার পাটা তুলতে না তুলতে, একটাই দমে হিল্লেল উত্তর দিলেন: 'যেটা তোমার কাছে ঘৃণ্য, সেটা অন্য কারো সাথে করিওনা। এটি তাওরাত-এর সম্পূর্ণ শিক্ষা। বাকি সব শুধুমাত্র বিশ্লেষণ। এখন যাও, শিখতে যাও।'

আধ্যাত্মিক সাধনার দেশে মন বা জীবাত্মা ও বিবেক বা মনের মানুষ একই ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কে থাকে। লালন সাঁইজির 'মনের কথা বলব কারে' বাণীতে এই প্রধান বাসনা প্রকাশ করেছেন: 'মনের মানুষ মনে রাখব, কর যোগাব মনের শিরে'। এই কথার একটা বিশ্লেষণ দেওয়া যায় যে নিজের মনকে শাসন করবে ও নিয়ন্ত্রণে রাখবে উদিত বিবেক-চেতনা। এবং বুকের কথা অর্থাৎ হৃদয়ের জ্ঞান সমলয় হবে মুখের কথার সাথে। তা শুধু নয়, কর্মের সাথেও। এই স্বর্ণনির্মিত আইন বিশেষভাবে অনুসরণ করা উচিৎ সাধকদের। বেশির ভাগ স্থূল স্তরে দৈন্য গানে লালন সাঁইজি, গুরুর নাম ধরে, একটি আকুল নিবেদিত আবেদন জানান— জীব, পাপী, অধম, অধীন, অবোধ, ইতরপনা স্বভাব, যার সদায় ঘটে কুমতি। যখন সাঁইজির এই বাণীগুলো বলা হয়, তখন একটা বোধ আসতে পারে গায়কের ও শ্রোতার উভয়ে- এই বোধের আসার কথা। আসলে নিজের মধ্যে যে দোষ বা ভুলভ্রান্তি বা অন্ধকার থাকে, এগুলো স্বীকার ও সংশোধন না করার পর্যন্ত কেউ মানুষ হিসেবে উঠতে পারে না। মানুষ হিসেবে না উঠতে পারলে ভালোবাসা লওয়া-দেওয়া দূরের কথা।

স্বাভাবিক পরিবেশে জীব আত্মনিয়ন্ত্রণ আনার প্রয়োজন ঘটে না। বেঁচে থাকার চেষ্টায় খাদ্য, নিরাপদ ও প্রজনন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই রকম জীবনে শিক্ষা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। বোধহয় জগতের প্রতি মানুষের স্বভাবগত কৌতূহলে, বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ে পড়ে পালিত পশু-পাখির শিক্ষার সম্ভাবনা পরীক্ষা করলে— ইঁদুর গাড়ি চালালে, হাতি বা বানর ছবি আঁকালে, গরু সহজ অংখ্য সমাধান করে আনন্দ দেখালে, কাক প্ল্যাস্টিক বোতলের ছিপির রিসাইক্লিং করলে... আবার লক্ষ লক্ষ ভিডিও পাওয়া যায় সামাজিক মাধ্যমে যেখানে পশু-পাখির সংবেদনশীলতা ও বিপদ থেকে উদ্ধার করার

টান দেখানো হয়। তাই বলা যাবে যে মানব জাতি চাইতে জীবের আচার-আচরণের সীমানা শুধু শিক্ষায় নয়, পরিকল্পনায় ও কল্পনায়, কাল জড়িত আফসোস-আশাতে। সহজ কথায়: বহুতের মধ্যে একতা বা অর্থ খোঁজায়। এবং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা। অভিপ্রেত খাদ্য ও প্রজননের নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশের উন্নয়ন শুধুমাত্র মানুষের। আমার গুরুর একটি কথায় স্পষ্টভাবে এই ভাবনাটি প্রকাশ করে, সেটা হচ্ছে মানুষকে গঠন করা হয় যখন মিলে শুদ্ধ আচার, শুদ্ধ বিচার, সুপরিবেশ, সুখাদ্য ও সুশিক্ষা। তার কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র মানুষ তার নিজস্ব পরিবেশ নষ্ট করতে পারে, তার নিজের ধ্বংস বানাতে পারে। বেঁচে থাকার বাহিরে, মানুষ অস্বাভাবিক বা অপ্রাকৃতিক খরচ করে যায়। এই জন্যে প্রেম বা ভালোবাসা প্রতিষ্ঠান করার প্রথম ধাপ হচ্ছে কুকর্ম থেকে দূরে থাকা। এক কথায়: ব্যক্তিস্বার্থ বিয়োগ করা। কেননা, 'আশেকে উন্মত্ত যারা, তাদের মনের বিয়োগ জানে তারা'। অন্যের সম্পদ চুরি না করা, অন্যের সাথে মিথ্যা কথা না বলা, অন্যের হিংসা-নিন্দা না করা, অন্যকে অকারণে আঘাত না করা কর্মে বা কথাবার্তায়, মানার তালিকা চলতে থাকতে পারবেই... এই নিষেধাজ্ঞার তালিকাটি হচ্ছে দুইজনের মধ্যে সত্য বিশ্বাস ও সহজ মান-সম্মান, ও সমাজ জুড়ে সভ্যতা প্রতিষ্ঠান করার একমাত্র উপায়।

লালন সাঁইজি জায়গায় জায়গায় বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, এই নিষেধাজ্ঞাগুলো আসলে সামাজিক ধর্মের বিষয় নয়, প্রেমের বিষয়: 'প্রেমে মজলে ধর্মাধর্ম ছাড়তে হয় (প্রেম কি সামান্যেতে রাখা যায়)' বা 'না মানে সে ধর্মাধর্ম, না মানে সে কর্মাকর্ম, যার হয়েছে বিচার সাম্য, লালন কয় তার করণ সারা'। সম্পূর্ণভাবে এই কথাটি প্রকাশ করেছেন 'পাপপুণ্যের কথা আমি কারে বা শুধাই' বাণীতে, বিশেষভাবে এখানে: 'সূক্ষ্মজ্ঞানে বিচার করলে, পাপপুণ্যের আর নাই বালাই'। কিন্তু যেমন সুস্বাস্থ্যের অর্থ শুধু আরোগ্য অবস্থা নয়, একটি সম্পর্কের মধ্যে শুধু নিরানন্দের অভাব থাকলে প্রেমময় সম্পর্ক বলা অযৌক্তিক। রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আসলে দুঃখজনক, একজন নারী গর্ব বোধ করতে পারে এই কথাটি প্রকাশ করে যে: 'আমার স্বামী খুব ভালো, আমারে মারে না, আমাকে অহেতুক গালিগালাজ করে না'। তবে এ রকম কথা কত শোনা যায়... তাই এই মনের বিকাশ ঘটানো কত গুরুত্বপূর্ণ তা বলার মতন নয়। লালন সাঁইজির দর্শনে, সিদ্ধির বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যখন জীবাত্মা সাধুর সাথে তুলনা করা হয়, যেমন: 'বাল্য-বৃদ্ধ সকলি কয়, সাধু চিত্ত আনন্দময়, ফকির লালন বলে আমার সদায় যায় না মনের নিরানন্দ (মনের হল মতি মন্দ)'। এই আনন্দের অর্থলাভ ও নিরানন্দের ক্ষতি হিসাবটা দেখার পথ নিম্নে উল্লেখিত বাণী স্পষ্টভাবে বুঝায়:

আমার হয় না রে সেই মনের মত মন।
কবে জানব সেই রাগের করণ॥

পড়ে রিপু ইন্দ্রিয় ভোলে,
মন বেড়ায় রে ডালে ডালে।
দুই মনে এক মন হইলে, এড়ায় শমন॥

রসিক ভক্ত যারা
মনে মন মিশাল তারা।
শাসন করে তিনটি ধারা, পেল রতন॥

কবে হবে নাগিনী বশ
সাধব কবে অমৃত রস।
সিরাজ সাঁই কয় বিষে বিনাশ, হলি লালন॥

অর্থাৎ নিরানন্দ ও সত্যানন্দের মধ্যে যে পার্থক্য, আশা করি বোঝা যাবে এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে, 'পজিটিভ এক' নামে। এখন প্রশ্ন হলো উপরে গানের বাণীতে—লালন কোন রতনের কথা বললেন? তার পাওয়ার পথ কী হতে পারে? এখন এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টায় ঢুকে পড়লাম। এখানে একটি আধুনিক চিন্তার কথা মিলে যায়। অহিংস্র যোগাযোগ (non-violent communication) মার্কিন আচরণ মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এর মধ্যে দুটি অমূল্য শিক্ষা পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে নিজের স্বস্তি-অস্বস্তি বোধ প্রকাশ করার কৌশল, আর একটা হচ্ছে অনুরোধ জানানোর কায়দা। বালাবহুল্য এই দুটি কাজ করতে পারলে একজনের সৎ সাহস ও আত্মমর্যাদা সুস্থ হয়ে থাকে, এবং যার সাথে এই যোগাযোগ করা হয়, তাঁকে মান-সম্মান দেখিয়ে শান্ত করা যায়। তার প্রধান বর্ণনা হচ্ছে—পরের দোষ দিতে বা বিচার করতে নেই, নিজের উপলব্ধি, পরের আচার-আচরণের ফলাফল ও বাস্তব বাঞ্ছনীয় কর্ম, সহজ সরল কথায় বুঝাতে। এই অহিংস্র যোগাযোগ তথ্যে স্বর্ণনির্মিত আইনের সর্বজনীন একটি রূপ। সংক্ষেপ করে, শিখাচ্ছে যে, উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত ভালো। বাস্তবের সীমা নেই। কথা ও কর্ম দিয়ে একটি উদ্দেশ্য প্রকাশ করা যায়। কিন্তু এই সব কথা ও কর্মের সম্ভবনার সংখ্যা একাধিক। এর উপরে, মনে রাখা ভালো যে ঘৃণা প্রেমের বিপরীত নয়... ঘৃণা আসলে প্রেমের বিধ্বংসী একটা রূপ। প্রেমের বিপরীত উদাসীনতা। তাই, প্রেম বুঝার জন্যে, 'নেগাটিভ' থেকে 'পজিটিভ' জরুরি।

খ. 'পজিটিভ এক' : 'প্রেম করা কি কথারি কথা'

২০১০ সালের দিকের পারিস্যে একটি অ্যার্ট গ্যালেরিতে মার্কিন বুদ্ধ গুরু গেশে মাইকেল রোছ (Geshe Michael Roach)-এর একটি আলোচনাসভায় গিয়েছিলাম। উপস্থিত যারা ছিল, কেউ সুসঙ্গের কথা বলত, কেউ আর্থিক বিষয় ধরত, কেউ সুখ-আনন্দের প্রসঙ্গ জানতে চাইত। আসলে, প্রায় সবারই একই প্রশ্ন করত তবে নানান রূপে: 'আমার জীবনে যেটা চাই সেটা কী করে পেতে পারি?' সংক্ষেপ করে, গেশের

উত্তর ছিল: 'যেটা তুমি চাও, সেটা দেওয়া শিখো ও অন্যকে দিতে থাকো'। স্বর্ণনির্মিত আইনের আর একটা রূপ হচ্ছে: "do unto others what you would have them do unto you", অর্থাৎ 'যে রকম ব্যবহার পেতে চাও অন্যের কাছ থেকে, সেটাই করো অন্যের সাথে'। এখানে এই বাংলা প্রবাদ-বাক্য মনে পড়ে: 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। অর্থাৎ স্বায়ত্ব কর্মে নিজের সুখ-দুঃখের উপরে একটি প্রেরণা।

"Love is what love does" এই ইংরেজি প্রবাদ-বাক্য অনেক জনপ্রিয়। তার অনূদিত অর্থ: 'প্রেম মাত্র কর্মে প্রমাণিত'। বাংলা ভাষায় 'আগে দর্শনধারী পরে গুণবিচারী'। এখানে বোঝা যাচ্ছে যে, ভালোবাসা শুধু একটি বোধ নয়, একটি নামও নয়। ভালোবাসার নাম ধরতে চাইলে, তাকে বাস্তবায়ন করা লাগেই প্রকাশিত রূপে। পাতঞ্জলের যোগদর্শন অনুযায়ে, তৃতীয় অধ্যায় (বিভূতিপাদ নামে) ২৩ সূত্রের এই অনুবাদ দেন ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার: 'মৈত্র্যাদিতে সংযম করিলে লাভ হয়'। শ্রী চৈতন্যের উত্তরাধিকার সূত্রে, লালন সাঁইজির একটি বাণীতে প্রেমের প্রকাশিত রূপ কী হতে পারে, সেটা বলে গেছেন, সাধনার নির্দেশ-উপদেশ মিশিয়ে:

প্রেমের ভাব জেনেছে যারা,
গুরু রূপে নয়ন দিয়া হয়েছে আত্মহারা (আপ্তহারা)॥

সখ্য শান্ত দাস্য প্রেমে
বাৎসল্য আর মধু প্রেমে
পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চপ্রেমে
বচ্ছে শত ধারা॥

পঞ্চানন খায় ধুতুরা
ঘটা হয়ে মাতোয়ারা
তারা মুখে বলে রাম, হরি রাম
ঐ প্রেমের প্রেমিক যারা॥

খেয়ে তাঁর নামের সুধা
খেলে যায় ভব ক্ষুধা।
কখনো গরল-সুধা
পান করেনা তারা॥

সদায় থাকে নিষ্ঠা রতি
হয়ে মরার মরা।
কত মণি-মুক্তা রতন-হীরা
অর্থলোভী লায়েক যারা॥

প্রেম শক্তি চতুর্দলে
কুম্ভকে উঠায় ঠেলে।
প্রেম-শক্তির বাহুবলে
উজান ধরায় তারা॥

শতদল লঙ্ঘন করে
সহস্রারে কায় যারা।
লালনের এই ফলাফল
আসা-যাওয়ার কর্মসারা॥

এখানে সাধনা ক্ষেত্র বা পদ্ধতির বর্ণনা পেরিয়ে, দুইটা তথ্য ধরে বিশ্লেষণে যাব। প্রথম তথ্য হচ্ছে পঞ্চপ্রেম, দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে এই রত্নের কথা। সখ্য, দাস্য, শান্ত, বাৎসল্য ও মধু নামে এই রহস্যময় প্রেমের পাঁচ প্রকার। শ্রী চৈতন্যের পাঁচ প্রকার প্রেম ধারণ করতে পারলে তবে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসা যায়। আমার কাছে এই সিদ্ধিটি মানুষের পরম প্রাপ্তি। আমার মনে পড়ে একটা ফরাসি বইয়ের কথা। ২০১০ সালে গীমে জাদুঘরে (Guimet Museum) প্রাচীন ও আধুনিক মণ্ডলী নিয়ে একটি প্রদর্শন ব্যবস্থাপনা হল। ঐ জাদুঘরের এশিয়ান সংকলনের পাশে কিছু পশ্চিমা শিল্পীদের চিত্রও দেখানো হয়েছিল। এই প্রদর্শনের গ্রন্থ লিখিয়েছিলেন ফরাসি দার্শনিক, প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ধ্যানের শিক্ষক ও জনপ্রিয় আধ্যাত্মিক লেখক ফ্যাব্রিস মিডাল (Fabrice Midal)। গ্রন্থের শিরনাম ছিল *Mandalas, Retrouver l'Unité du Monde* ('মণ্ডলী - জগতের ঐক্যের ছাবি')। এর ভূমিকায়, মানব জীবনের একটা প্রতিছবি দেওয়া হয়েছিল, মণ্ডলীর রূপে। 'আমি' কেন্দ্রে বসিয়ে, প্রথম বৃত্তে পাওয়া যাবে যাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গঠন করা হয়েছে - তাঁদের সংখ্যা একেবারে কম বলে, প্রথম বৃত্তটি খুব ছোট। দ্বিতীয় বৃত্তে থাকবে যাদের সাথে একটা সুপরিচিত সম্পর্ক রাখা হয়। আর ক্রমে ক্রমে শেষ বৃত্ত পর্যন্ত, যেটা সবচেয়ে বড়, থাকবে যাদের সাথে সম্পর্কটা অনেক ঢিলা। বোঝা যাচ্ছে যত দূরে যাই, তত পারস্পরিক প্রভাব কমে যায়।

আবার একটু চেষ্টা করলে, ঋষি পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্রে পঞ্চনিয়মের সাথে মিলানো যায়। শৌচে বাৎসল্য, শান্ত সন্তোষে, তপঃ বা তাপস্যে মধু, সখ্য স্বাধ্যায়ে ও দাস্য ঈশ্বর প্রণিধানে। এই পাঁচটি নিয়ম দিয়ে মোহকে অতিক্রম করার সাথেই, আত্মমর্যাদা ও প্রেম তৈরি করা যায়, এবং নিজের জীবন সফল হয়। এই আত্মপ্রেম ব্যাপারটি শেষ অংশে ধরব, তবে এই সময়ে বলে রাখা প্রাসঙ্গিক মনে করলাম। আবার সম্পর্কে ঢুকে, ঐ পঞ্চপ্রেমের মধ্যে যেটা সব চেয়ে বেশি স্বাধীন ও সহজ সেটা নিয়ে শুরু করি। শান্ত প্রেম শরীরের ভ্যান বায়ুর মতন। মানে যেখানে সুসম্পর্ক থাকে এই জীবন মণ্ডলীতে সেখানেই শান্ত প্রেম থাকার কথা। এই প্রেমটি ভদ্র, অহিংস ও হাল্কাভাবে চিত্তাকর্ষক। শান্ত প্রেম বেশি প্রকাশ পাবে দূরের বৃত্তে, যেখানে দায়িত্ব ও বাধ্যতা সব চেয়ে কম

থাকে। সন্তোষ নিয়মের সাথে শান্ত প্রেমের মিল দেখতে পাই এই কারণে যে সন্তোষ অনুসরণ করতে পারলে ত্যাগের সুখ পাওয়া যায়, ও এই ত্যাগের সুখে তবে মনটা শান্ত থাকে। মনটা শান্ত থাকলে তবে অন্যের সাথে শান্তভাবে লেনদেন করা সম্ভব, তা ছাড়া নয়। এর পরে, সখ্য প্রেমের আর একটা নাম বন্ধুত্ব বা ভ্রাতৃত্ব। পারস্পরিক ভরসা ও অবলম্বন, নিশ্চিন্তায় অবিচারী ভাব বিনিময়, আনন্দ, বন্ধুত্বের কিছু সাধারণ গুণ। সখ্য সম্পর্ক মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ, তবে এর মধ্যে বাধ্যতা কম থাকে। বন্ধুত্বে একটা আয়না তৈরি হয়, খোলা মনে কথাবার্তার মাধ্যমে সম্পর্কটি নিজের পরিচয়, নিজের ভালোমন্দ বোঝা সম্ভব। এজন্যে স্বাধ্যায়ের সাথে মিলিয়ে দিয়েছি।

এখান থেকে বাধ্যতা বা সম্পর্কের বন্ধনের ও দায়িত্বের চাপ বেড়ে যায়। তৃতীয় ধাপে বাৎসল্য প্রেম। আমাদের সকলেরই জন্ম গ্রহণ করতে হয়েছে। তাই, যেভাবে হোক না কেন, সবারই মা-বাবা বা মা-বাবার প্রতিনিধি থাকে, যাঁদের আদিগুরু বা শিক্ষাগুরু বলে। তাঁদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি প্রাতিষ্ঠানিক চলাফেরার গতি, যুক্তিপূর্ণ পরিমাণে দুটি আদর ও শাসন দিয়ে। বাৎসল্য অর্থাৎ বাচ্চার সাথে যে প্রেম হয়। এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম গুণ পাওয়া যাবে, যেমন উদ্বেগ, ধৈর্য, সহানুভূতি, পরিপোষণ আর, সম্ভবত, ত্যাগ। এই বাৎসল্য প্রেমে সব চেয়ে বেশি বাধ্যতা, দায়িত্ব ও অধিকার থাকে। শৌচের সাথে মিল দেখতে পাই কারণ মানুষের প্রাথমিক শিক্ষা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। যে মুহূর্তে একটা বাচ্চা নিজের দেহের দায়িত্বে দাঁড়িয়ে উঠতে পারে, সেই দিনে তার স্বাবলম্বী অস্তিত্বের শুরু। দাস্য প্রেম গুরুজনের সাথে একটা প্রকাশিত রূপ। নম্র ভাব ধরে, হুকুম-উপদেশ মেনে চলা তার প্রধান প্রকাশ। বিশেষভাবে প্রেম ধারণ করতে গেলে, এই ধরণটি সাধকের বা ভক্তগণের প্রযোজ্য একটি ধাপ। কারণ এই দাস্য প্রেমে ঢুকতে চাইলে অহংকার ত্যাগ করা লাগেই। এখানে দায়িত্ব কম, অধিকারও কম, কিন্তু বাধ্যতা বেশি। অবশ্যই ঈশ্বর প্রণিধানের সাথে মিলটা সহজে বোঝা যায়।

অবশেষে, সাধারণ্যে যখন ভালোবাসার বিষয়টি ধরা হয়, তখন বেশির ভাগ মানুষের মাথায় এই মধু ধরণের প্রেম আসে। প্রেমিক-প্রেমিকা, জীবনসঙ্গী-সঙ্গিনী, সহধর্মী-ধর্মিণী, স্বামী-স্ত্রী তার ব্যক্ত রূপ। এই মধু সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক, বললে ভুল হবে না। ২০১৭ সালে বিশ্ববিখ্যাত একজন যোগী আমার বাসাতে থেকে গিয়েছিল কয়েক দিনে, প্যারিসে তাঁর একটি প্রোগ্রামের জন্যে। আমার সঙ্গীর সাথে তখন আমরা তাঁকে আতিথেয়তা করেছিলাম। একদিন কথায় কথায় তাঁর জীবনের ব্যর্থতার গল্প বলার শুরু করলেন। বলতে বলতে হতাশ হয়ে দীর্ঘ একটা শ্বাস ছেড়ে বয়সী যোগব্যায়াম মাস্টার বললেন: 'সবাইকে ভালোবাসতে হয় বুঝি। কিন্তু এই কাজটি এত কঠিন কেন?!'। তখন আমার সঙ্গীর ধারে এই উত্তর এল: 'সবারই প্রতি মঙ্গল কামনা করার কাজটি তো যথেষ্ট কঠিন। আমরা অনেক লিমিটেড, এটা স্বীকার না করলে কি করে চলছেন? এই জীবনে যদি দু-একজনকে সঠিকভাবে ভালোবাসতে পারি তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।' এই কথা শুনে, মাস্টার চুপচাপ হয় পড়ল, চোখের

জলে ভেসে চিন্তামুগ্ধ ক্ষুদ্র একটি হাসি ঠোঁটে উঠল। লোভের নানান রূপ থাকতে পারে। অনেক টাকাপয়সা জমা রাখা তার একটা; অনেককে ভালোবাসার আশাটি আর একটা।

'ফকির' শব্দটি আরবি ভাষা থেকে এসেছে। তার ব্যুৎপত্তি 'faqr' যার অর্থ দরিদ্র্য। ফকিরি যারা করে, তারা অনিত্য বা পরিবর্তনশীল দুনিয়ার প্রতি লোভ বা জীবাত্মার স্বভাবগত আকর্ষণ ত্যাগ করে থাকে। গুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করা মানে ভক্তের সমস্ত কিছু গুরুর কাছে বিক্রি করে দীক্ষা গ্রহণ করা। লালন সাঁইজির এই বাণীতে তাঁদের বলা হয় 'অর্থলোভী লায়েক যারা'। এখানে বোঝা যাচ্ছে যে সব সাধারণ দৃশ্যমান রত্ন, হীরা, মুক্তা, মণি, সোনা পাওয়া যায়, অর্থাৎ যেটা সবচেয়ে বেশি দামি সাধারণ মানুষের চোখে, ফকিরি সাধনায় তাদের রূপ আপাতবৈপরীত। এই ধনের ওজন নেই, আবার বোধে বা অনুভব-অনুভূতি হিসেবে সে অনেক ভারী। অনিত্যের দিকে আর না তাকিয়ে, ফকির যারা তারা নিত্যের দিকে তাকানোর চেষ্টা করে। 'মাশুক রূপ হৃদয়ে রেখে, থাকে সে পরম সুখে, শত শত স্বর্গ দেখে, মাশুকের চরণে পায় (আশেকে উন্মত্ত যারা)' ... এখানে তপঃ নিয়ম কতটুকু প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিক, এই কথা মনে পড়ে: 'মধু খায় সে অলিজনা (আপন ঘরের খবর নে না)'। অলি বা সাধক না হলে, মধু পায় না কেউ। এই বিষয়টি আশা করি আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে নিচ উল্লেখিত বাণীতে:

না বুঝে মজনা পিরিতে।
বুঝে শুজে কর পিরিত,
শেষ ভালো দাঁড়ায় যাতে॥

পিরিত করার হয় বাসনা
সাধুর কাছে জান গে বেণা।
লোহা যেমন স্পর্শে সোনা, তেমতি মতে॥

ভবের পিরিত ভূতের কীর্তন
ক্ষণেক বিচ্ছেদ, ক্ষণেক মিলন।
অবশেষে ঘটায় মরণ, তেমাথা পথে॥

এক পিরিতের বিভাগ চলন
কেউ স্বর্গ কেউ নরক গমন।
বিনয় করে বলছে লালন, এই জগতে॥

ভবের পিরিত দুই দিকে বিশ্লেষণ করা যায়। একটা হচ্ছে ঐ অনিত্য সামাজিক সম্পর্ক। আর একটা মানে শারীরিক মিলন। কাম শক্তি সৃষ্টির প্রধান উপাদান। তার প্রেরণায় এষণ ও সৃজনশীলতা ঘটে। আধুনিক পশ্চিমায় অবচেতনার আবিষ্কারক সিগমন্ড ফ্রয়েডের ধারণায়, মানুষ যা কিছু করে, কাম শক্তির কর্তৃত্বে করে। ফ্রয়েডের

পরে, ভাগ্যিস, তাঁর থেকে আরও অনেক উদার ও শুভদর্শী মনোবিজ্ঞানী এলেন... কিন্তু লালন সাঁইজির প্রেমের কথা বুঝতে হলে এটুকই তো মানতে হবে যে প্রজনন কামে তৈরি। তাই এই কাম শক্তি সব মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। যখন ভালোবাসার কথা বলা হয়, তখনই ঐ মধু ধরন প্রথমে কেন মনে আসে? যৌনসহবাস ছাড়া কি প্রেম হয় না? নিশ্চয় হয়। কিন্তু ঐ মধু, রোম্যান্টিক প্রেম সবাই প্রাধান্য মনে করে। এখানে সাধকের লক্ষ্য যেহেতু ক্ষণেক মিলনে নয়, নিত্যানন্দে, সেইহেতু বোঝা যায় প্রেমের ঐ পঞ্চগুণ অর্জন করার জন্যে কাম শক্তি বা নাগিনীকে বশ করা লাগেই। বাহ্য কর্মের দিকে যেমন অন্যের ভোজনে আমার পেট ভরে না, অন্যের আবর্জনা ত্যাগ করলে আমার অভ্যন্তর পরিষ্কার হয় না, অন্যের ঘুমে আমার ক্লান্তি দূর হয় না, তেমনি অন্তর সংস্কার বা আত্মশুদ্ধি নিজেকে করতেই হয়। এর ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাই পরবর্তী ও শেষ অংশে স্বপ্রেম বিষয়টি ধরব।

গ. 'শূন্য' : 'আপনারে আপনি, ভুলে রব্বানি, আপনি ভাসে আপন প্রেমে বলে'

নাগিনীর রূপে যে কাম শক্তি, তার আর একটা নাম কুলকুণ্ডলিনী। এই নামটি যোগশাস্ত্রে ব্যবহৃত। সংক্ষেপ করে কুলকুণ্ডলিনীর গল্প শোনাই। সাততলার কথা লালন সাঁইজির বাণীতে পাওয়া যায় ('আছে আদি [আদ] মক্কা এই মানব দেহে, দেখ না রে মন ভেয়ে'), যাকে সাত চক্র বলে। এবং স্পষ্টভাবে একাধিক দেহতত্ত্বের বর্ণনায় তাদের নাম ও রূপ দেওয়া হয়, যেমন মূলাধার ('ধন্য ধন্য বলি যারে [তারে]') বা চতুর্দল, স্বাধিষ্ঠান বা ষড়দল ('কিবা শোভা দ্বিদলের 'পরে'), মণিপুর ('আজব আয়না মহল মণী গভীরে'), অনাহত বা হৃদ কমল, আজ্ঞা বা দ্বিদল বা 'মন নয়ন', ও সহস্রদল ('আপনারে আপনি রে মন, না জানো ঠিকানা')। তাদের সাথে তিন ধারা বা তিন তার বা তিন গলি, অর্থাৎ যোগীর দেহে তিনটি প্রধান নাড়ি—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। যোগীর সাধনার একটা উদ্দেশ্য কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করে যেন মূলাধার থেকে সাত চক্র ভেদ করে সহস্রে পৌঁছায়, এবং চলাচল করতে থাকে ঊর্ধ্ব দিকে। যেমন: 'শহরে সহস্র পাড়া, তিন গলি তার এক মহড়া (গুরুর দয়া যারে হয় সেই জানে)'।

২০২১ সালের শুরুর দিকে একজন আমার সাথে যোগাযোগ করল, তার একটা সমস্যার সমাধানের খোঁজে। ইউটুবে একটা ভিডিও দেখে প্রাণায়ম চর্চা করেছিল, এবং তার দৈহিক অনুভবে বেশ বিপদে পড়েছিল। যোগব্যায়াম ও নানান আধুনিক ধ্যান ধারার যে জনপ্রিয়তা ঘটেছে "উন্নত" জীবনের চাপ কমানোর আশাতে। তার ফলে, যুক্তরাষ্ট্রে ও যুক্তরাজ্যে কয়েকটা বিশেষ মানসিক চিকিৎসা ক্লিনিক প্রতিষ্ঠান করা হয়েছে গত ২০ বছর ধরে। প্যারিসে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ সেন্ট অ্যান হাসপাতালে (Hôpital Sainte Anne), ছোট একটি বিভাগ থাকে আধ্যাত্মিক কুফলাফলের চিকিৎসা দেওয়ার জন্যে। এ সব জায়গাতে, কুণ্ডলিনী সাইকোসিস (kundalini psychosis) নামে একটা মানসিক রোগ চিকিৎসা দেওয়া হয়।

প্যারিসের সেন্ট অ্যান হাসপাতালের সম্মুখভাগ

এই রোগের গল্পের সাথে ইংরেজি একটি প্রবাদ-বাক্য মনে পড়ে: 'the road to hell is paved with good intentions'। বাংলা ভাষায় তার মানে 'নরকের পথ শুভাকাঙ্ক্ষায় নির্মিত'। অন্যের উপকার করতে গিয়ে অনেকে বিপদে পড়ে ও পড়ায়, সবারই কাছে এরকম বাস্তব কাহিনী শুনা যায়। লালন সাঁইজির ভাষায়: 'ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়, আপন ঘর না বুঝে বাহিরে খুঁজে পড়বি ধাঁধায়'। কেননা, নিজের জন্যেও ভালো করতে যাওয়ার সোজা রাস্তা নয়। লালন সাঁইজির যত বাণী পাওয়া যায়, এ সবের মধ্যে সাত তলার তালিকার একটি চক্রের কথা পাওয়া যায় না। তার নাম বিশুদ্ধাকা, অর্থাৎ ষোলদল, তার স্থান গলায়। আমার গুরুর বিশ্লেষণে, ষোলদলে আত্মতত্ত্ব বা আমিত্ব জ্ঞান। রাজ ক্ষ্যাপার ভাষায়, 'আমি' স্বরবর্ণ, 'তুমি' ব্যঞ্জনবর্ণ। অতএব, যেমন স্বরবর্ণ ছাড়া ব্যঞ্জনবর্ণ বাজান যায় না, তেমন 'আমি' না থাকলে 'তুমি'-এর সাথে কোন প্রেম ঘটতে পারে না। এই অংশে একটা কথা বোঝাতে চেষ্টা করব, সেটা হচ্ছে নিজের পরিচয় শূন্যতায় না পৌঁছিয়ে আসল এই সঠিক 'আমি' পাওয়ার সম্ভব নয়। এখন 'আমি'কে চেনার যুক্তি ও কর্তব্য ধরি।

যত সঙ্গী থাকুক না কেন একজনের আশপাশে, মানুষের অন্তর জীবন একাকী, এটা সবাই অস্বীকার করতে অক্ষম। লালন সাঁইজি এই কথা কতবার বলে গেছেন আসলে তার সংখ্য করা কঠিন। যেমন 'থাকিতে মনে হয় একাকী (মুরশিদ [আল্লাহ] বল মনরে পাখি)' বা নিম্নে উল্লেখিত বাণী:

মন তোর আপন বলতে কে আছে
কার কান্দায় কান্দ মিছে॥

থাক সে ভবের ভাই-বেরাদর
প্রাণ-পাখি সে হয় আপনার।
পরের মাথায় মজিয়ে এবার
প্রাপ্ত ধন হারায় পাছে॥

সারা নিশি দেখ মনরায়
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে রয়।
যাবার বেলায় কে কারে কয়
দেহ-প্রাণ তেমনি সে যে॥

মিছে মায়ায় মদ খেও না
প্রাপ্ত পথ ভুলে যেও না।
এবার গেলে আর হবেনা
পড়বি ক'য় যুগের পেঁচে॥

আসতে একা এলি রে মন
যেতে একা যাবি তখন।
সিরাজ সাঁই বলে রে লালন
কার নাচায় নাচো মিছে॥

এই বাণীতে সতর্ক বাক্য স্পষ্ট করে, মোহ ভাঙ্গার চেষ্টায়। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে অনুযায়ে, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান মিলে ত্রিযোগ বলা হয়, এবং এই তিনটি সমাধি সিদ্ধির মুল উপাদান। সাধারণ বাংলা ভাষায়, তপঃ মানে তাপ, অর্থাৎ শরীরের উদ্যম বা পরিশ্রম দিয়ে অন্তর আগুন জাগ্রত করা, চেনা এবং বশ করা। এই আগুনের আর একটা নাম কাম শক্তি। স্বাধ্যায় লালন সাঁইজির ভাষায় মানে 'দেল কোরআন' পাঠ করা। অর্থাৎ নিগুমে বা ধ্যানে যে আত্মজ্ঞান, সেটা স্বাধ্যায়ের সিদ্ধি। এবং ঈশ্বর প্রণিধান আত্মসমর্পণ বা গুরুর কাছে দীক্ষিত হওয়া। এখানে পাওয়া যাচ্ছে বাউল-ফকিরের সাধনার তিনটি বিভাগ, যেটা সুধীর চক্রবর্তী সুফি প্রচলিত শব্দকোষ থেকে দেখে দিয়েছে আরিফ (বুদ্ধি-জ্ঞান), আশিক (ইন্দ্রিয় কেন্দ্রিক) ও সালিক (প্রেম বা ভক্তি)। সাঁইজির ইসলামি পরিভাষায় আহমদ যদি আহাদকে পেতে চায়, তাহলে মিমকে বোঝা উচিৎ ('আকার নিরাকার সেই রব্বানা')। এখানে এই ত্রিযোগের সাথে সুফি ধারণাটি মেলালে বোঝা যাবে আহমদ স্বাধ্যায় নিয়মে, মিম তপঃ নিয়মে, এবং আহাদ ঈশ্বর প্রণিধান নিয়মে। অতএব বাউল-ফকিরের মতে গুরুকে ধরে, একক সাধনার সীমান্তে

যুগল সাধনা প্রযোজ্য মুক্তি ঘটাতে। স্বাধ্যায় বিষয় নিয়ে আর একটা কথা এখানে ধরি। লালন সাঁইজির দর্শনে, এই আত্মতত্ত্ব সিদ্ধি লাভ করতে পারলে কেমনে প্রেম গঠন হয়, সেটা বোঝা যায় অনেক পদে, যেমন 'আপনারে চিনলে পারে পরকে চিনা যায় তখন (ঠিক এর ঘরে ভুল পড়েছে মন)' বা 'আপনারে আপনি রে মন, না জান ঠিকানা / পরের অন্তর কেটে সমুদ্দর, কিসে যাবে জানা', বা 'সে যে আপনারে চিনলে পরে, যায় অচেনার চেনা (আমার আপন খবর আপনার হয় না)'। আরও গভীরভাবে:

আপনাকে আপনে যে জন জানে,
আপন আত্মাকে দেখেছে নয়নে।
সবে বলে আমি আমি,
আমি কে তা কেউ না জানে॥

এই প্রবন্ধের শুরুতে লিখেছিলাম যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অন্ধকার বা দিব্যজ্ঞানের অভাব, সেটা স্বীকার না করলে আসলে কারো সঙ্গে কোনো সুসম্পর্ক গঠন করা যায় না। কেননা, কোনো এক সময়, একটা সম্পর্কের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ বা রিপুর প্রভাব এসে পড়বে। সুতরাং সবারই মাথায় একটা ধারণা আসে— লোভের প্রকাশিত রূপ কী? ক্রোধের রূপ বা প্রকাশিত আচরণ কী? কেননা, মহৎ বা মদ ও মাৎসর্য্যের কথা বেশির ভাগ মানুষ বুঝতে পারে। মোহের কথা আর একটু কঠিন, যেহেতু বেশির ভাগ মানুষ মায়াতে আরাম পায়। এবং লজ্জা বা সামাজিক অভ্যাসের কারণে, কাম রিপুর কথা অনেকে নিজের মধ্যে স্বীকার করতে অক্ষম। এই কাম রিপু জয় করা সহজ কাজ নয়... 'কেউ নারী ছেড়ে জঙ্গলেতে যায়, স্বপ্নদোষ কি হয় না সেথায় (আপন মনের বাঘে যারে খায়)'। নিম্নে লালন সাঁইজির এই দুটি স্থূল বাণী উল্লেখ করলাম উদাহরণ হিসেবে, তবে তাদের বিশ্লেষণ বোঝাতে যাব না ভাষাটা সহজ বলে:

করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন।
প্রেম সাধিতে ফাঁপরে ওঠে কাম নদীর তুফান॥

প্রেম-রত্ন ধন পাওয়ার আশে
ত্রিবেণীর ঘাট বাঁধলাম কষে।
কাম-নদীর এক ধাক্কা এসে
ছিঁড়ে যায় বাঁধন ছাদন॥

বলব কি সে প্রেমের কথা
কাম হইলে প্রেমের লতা।
কাম ছাড়া প্রেম যথাতথা
নাই রে আগমন।

প্রেম-গুরু হয় পরমপতি
কাম-গুরু হয় নিজ পতি।

কাম ছাড়া প্রেম পাই কি গতি
ভেবে কয় লালন॥

এবং

শুদ্ধ প্রেম সাধল যারা, কাম রতি রাখল কোথা।
বল গো রসিক রসের মাফিক
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা॥

আগে উদয় কামের গতি
রস আগমন তারই সাথী।
সেই রস হয়ে স্থিতি
খেলছে মানুষ প্রেমদাতা॥

মন জানে সে রসের করণ
নয় রে সে প্রেমের ধরণ।
হৃদয়-জ্বলে হয় রে স্মরণ
কথায় কেবল বাজি জেতা॥

মনের অবাধ্য যে জন
আপনার আপনি ভোলে সে জন।
ভেবে কয় ফকির লালন
ডাকলে সে তো কয় না কথা॥

এই দুটি বাণীর তুলনায় সিদ্ধির স্তরে একটা বাণী দেখাচ্ছি। তাতে শূন্যতা বিষয়টা আশা করি পাঠকে উপলব্ধি পাওয়া যাবে।

মন রে, সামান্যে কি তারে পায়।
শুদ্ধ প্রেম ভক্তির বশ দয়াময়॥

কৃষ্ণের আনন্দপুরে
কামী লোভী যেতে নারে।
শুদ্ধ ভক্তি ভক্তের দ্বারে
সে চরণ-কমল নিকটে যায়॥

বাঞ্ছা থাকলে সিদ্ধি মুক্তি
তারে বলে হেতু ভক্তি।
নিহেতু ভক্তের রতি
সবে মাত্র দীন নাথের পায়॥

ব্রজের নিগূঢ় তত্ত্ব গোঁসাই
রূপের সব জানাল তাই।
লালন বলে, মোর সাধ্য নাই
সে দলে যেমত রসিক মহাশয়॥

লালন সাঁইজির দর্শনে আসলে যে এই শুদ্ধ প্রেম অর্জন করতে পেরেছে, সাধনার একাগ্রতায়, 'কপাট [মেরে] কামের ঘরে', সেই মহাগুরু। মনে রাখা ভালো যে তাঁর যুগের তুলনায়, সাঁইজির ধারণা যত উদার হোক না কেন, যত আধুনিক হোক না কেন, তবে যে সমাজে সে চলাফেরা করতেন, সেই সমাজের জন্যে তাঁর ভাব বাণী বলা। তাই এসব ভাব বাণীর মধ্যে নারীর দৃষ্টিক্ষণ থেকে যা লিখা হয়েছে, কেবল মাত্র শ্রী কৃষ্ণের সম্পর্কে জড়িত মা যশোদা, রাধা এবং গোপীগণ। এই পর্যবেক্ষণ করেছেন আবুল আহসান চৌধুরী। একজন নারীর একাকী বোধ বা বাসনা, একজন নারীর আসল সামাজিক ও আধ্যাত্মিক লড়ায় কী হতে পারে? সেটা লালন সাঁইজির পদে পাওয়ার কথা নয়। এই পথের ইতিহাসে, পুরুষ কাম ত্যাগের কথা পাওয়া যায় একাধিক। কিন্তু নারীর কাম বিরুদ্ধে যে জয়, তার অতীত যুগ থেকে কোন সাফলতার গল্প পাওয়া অসম্ভব। তবে পুরুষ-প্রকৃতি লীলার মাধ্যমে যেটা বোঝানো হয়, সেটা হচ্ছে আসলে পরম প্রাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছালে, কোন লৈঙ্গিক ভেদাভেদ থাকে না। নিষ্কামি যদি হওয়া যায়। যেমন এই তিনটি উক্তি উদাহরণ হিসেবে দিলাম:

১
পুরুষ কি প্রকৃতি আকার
সৃষ্টি সৃজন কালে।
(আদমে আহমদ এসে নবী নাম সে জানাল)

২
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ভবে
নপুংসক না সম্ভবে।
যে লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড 'পরে
কে দিব তুলনা তারে।
(নীচে পদ্ম চরক বাণে যুগল মিলন চাঁদ চকোরা)

৩
জান না মন প্রেমের প্রেমী কাজে গেলে,
পুরুষ প্রকৃতি স্বভাব থাকতে কি
প্রেম রসিক বলে॥
(জান না মন প্রেমের প্রেমী কাজে গেলে)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রাপ্তি পুরুষের কাছে, এই কথার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ আসার কথা নয়। দুঃখের বিষয় যে, এই পথ-মত যদিও নারী-কেন্দ্রিক ('মায়েরে ভজিলে হয় তার বাপের ঠিকানা' বা 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে'), তবুও পুরুষ দেহধারীর মধ্যে সত্য পূর্ণপ্রাপ্ত সাধুর সংখ্যা যত কম, প্রভাবশালী সাধু নারী একেবারে দুষ্প্রাপ্য। আসলে, লালন সাঁইজির নিজ সঙ্গিনীর বৈশিষ্ট্য, বা তাঁর ভক্ত-মেয়েদের গল্প কেউ জানে না। যখন নিঃসন্তান হয়ে সংসারের ঝামেলার মধ্যে থাকে না নারী সাধক, তখন তাদের কথা বলার বা জ্ঞান নিয়ে সময় কাটনোর অধিকার দেওয়ার বাধা থাকে কি? আবার গবেষকদের লেখায় একটি কথা পাওয়া যায় যে নারী সাধু পূর্ণ অধিকার পান, অর্থাৎ তাদের সাধনসঙ্গী না থাকা সত্ত্বেও ভক্ত দীক্ষিত করতে পারে। কিন্তু এই কথা আমার বাস্তবে দেখার সাথে মিলে না। মনে হয় বিদেশী গবেষককে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে তাঁদের এই রকম শুনানো হয়েছে। এবং বর্তমান বিধবা সাধু যারা, তাদের দৈনন্দিন অবস্থা কত করুণ, দেখলে ও লিখলে কষ্ট লাগে।

এই প্রবন্ধের উপসংহার ধাপে ঢুকি। যত খুঁজেছি, মাত্র দুইজন নারী ফকিরের কথা পেয়েছি, ননীবালা ও ফুলজান মায়ের। ননীবালার সন্ধান পেয়েছি অড্রে ফেল্লা (Audrey Fella) নামে একজন ফরাসি ইতিহাসবিদের সম্পাদিত 'নারী মরমীয়াবাদীর ইতিহাস ও অভিধান' ("Les Femmes Mystiques, Histoire et Dictionnaire")। ফ্রান্স ভট্টাচার্য্যের বর্ণনায় বোঝানো হয় ননীবালার জীবনে কত কষ্ট করেছেন ও পেয়েছেন, মাত্র তাঁর সাধনসঙ্গীর কুকর্মে। বাউল শিল্পী পার্বতী বাউলের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় ননীবালার সংগীত প্রতিভা ও মনোবলের গল্প। এবং ফুলজান মায়ের কথা আমার গুরুর কাছ থেকে

সাধুসঙ্গে গুরু নহির শাহের বাক্য শ্রবণরত দেবোরাহ

শুনেছি। আমাদের দৌলতপুর উপজেলার গ্রাম কাজিপুরের মেয়ে। মফাজ্জল শাহের সাথে তাঁর বিয়ে হওয়ার সাথে সাথেই হাঁটতে গেলেন রাজস্থান প্রদেশে, আজমির-শরিফে। ফিরে এসে, ফুলজান মা শ্বশুর বাড়িতে না উঠে, তেকালা ঘাটে নদীর ধারে থেকে গেলেন। আমার গুরুর গুরু তথা আমার দাদাগুরু দরবেশ লবান শাহের মা হেমারন্নেছা তাঁর ভক্ত ছিলেন। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রচারক রামশরণ পালের সঙ্গিনী সতী-মা তাঁদের শিক্ষিত ছেলে দুলালচাঁদের উদ্যোগে ও পরিশ্রমে সাধুসমাজে বড় একটি স্থান পেতে পেরেছেন। কোটিতে একজন... এখানে আমার এই প্রার্থনা থাকল, যেন এই তথ্যবহুল আধুনিক যুগে আরও জ্ঞানী শক্তিশালী জেদি স্বাবলম্বী নারী সাধককে জায়গা দেওয়া হোক, যেন পরবর্তী প্রজন্মে এই সাধারণ ধার্মিক নারীবিদ্বেষ মুছে যাক, এবং সাধারণ সমাজে ছড়িয়ে পড়ুক। তাতে আসলে সকলেরই জয় হবে। নতুবা না।

প্রবন্ধের প্রথম অংশে দেখা হল মনকে বিয়োগ করা মানে কুকর্ম থেকে বিরত থাকা। দ্বিতীয়তে দেখান হল প্রেম কার্যকর মাত্র যদি প্রমাণে থাকে। যেটা ঘটবে মনের বিকাশে। শেষ অংশে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে এই মনের বিয়োগ ও যোগ করার আশাতে, আত্মতত্ত্ব বা স্বাধ্যায় অর্জন করা অতি প্রয়োজন। সংক্ষেপ করে বলতে গেলে বলতে হয়: নেওয়ার চাইতে দেওয়া বড়। শুদ্ধভাবে এই লেনদেন করতে গেলে, তার আগে ও পাশে সচেতনভাবে নিজের সাথে শুদ্ধ-সুস্থ লেনদেন গড়ে তোলা উচিৎ। মহাভারত কাব্যের মূল শিক্ষা তা-ই: নিজ মর্ম জেনে ধর্ম পালন করো, তবে শুদ্ধ সঠিক কর্ম ঘটবে।

মানুষ অহংকারী, এই কথাটি বালাবহুল্য। অহংকারী না হলে অহংকার নিয়ে সকল শাস্ত্রে ও পবিত্রগ্রন্থে এত কথা থাকত না। 'অহংকার পতনের মূল', 'অহংকার মহাপাপ', ইত্যাদি। নিজেকে অহংকারী স্বীকার করা লাগবে কেন? এর উত্তর এই প্রবাদ-বাক্যে: 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর'...। আমরা তথ্য জেনে নিজেকে জ্ঞানী ও ক্ষমতাশীল মনে করি। বরং অনেক কিছু স্বাভাবিক ভেবে সঠিক গঠনমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে রাজি নয়। একা একা আমরা শিখেছি জীবাচার, দাঁড়ান, হাঁটা, দৌড়ানো, খাওয়া-দাওয়া, দম নেওয়া-ছাড়া, ঘুম পাড়া এবং যৌনাচার। যেটা আমাদের জীবনের বৃত্তিপ্রদান, এ সবের দিকে একবারও তাকাই না। এই ভিত্তির দুর্বলতা দেখতে পাই না। ফলে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবন ভারাক্রান্ত রোগে। বিজ্ঞানের বিকাশে রোগের লক্ষণ বা উপসর্গকে দমন করা যায়। তাতে কিছু অপ্রয়োজন কষ্ট কমে যায়। সেটাকে প্রতিকার বলা হয়। কিন্তু মানুষের মন এত কঠিন ও গভীর, তার মধ্যে এত আঁধার, এই কাজটা করা কি সম্ভব? সুতরং প্রেম কি মনগড়া একটি কল্পনা নয়? মানুষের নয়, ঐশ্বরিক মাত্র? আমরা কি 'বামন হয়ে চাঁদ হাতে' পেতে চাই?

জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়,
ধরতে গেলে কে হাতে পায়?
(এই মানুষ দেখ, সেই মানুষ আছে / কত মুনি ঋষি চারী যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে)

বেদান্তে বলা হয় ব্রহ্মাণ বা প্রভু সদ-চিত-আনন্দ (সত্য-চৈতন্য-সুখ)। রোম্যান ক্যাথোলিক চার্চের ক্যাটেচিজম (ধর্মতত্ত্ব) অনুযায়ী—প্রভু সত্য, ভালো ও সুন্দর। মাঝেমধ্যে জীবন প্রেরণা ভাষণে শোনা যায়—ভালো মানে সুন্দর, সত্য ও উপকারী। অর্থাৎ মন ভালো জগত ভালো। বরং 'যার মন ভালো নয়, সে পিরিতের মর্ম (ধর্ম, কর্ম) কি জানে' (শ্রীধাম ওড়াকান্দির গানে...) তালিমহীন আকার আসলে নিরাকারের চিহ্ন ধরতে পারেই না। অতএব, যেন এই জীবনটির মানে থাকে, বাস্তব নিয়ে থাকে ও বাস্তব থেকে ন্যায়ভাবে সহজ অনুমান করা উচিৎ। লিখে রাখলাম যুক্তিবিজ্ঞানে অনুমানের তিন প্রকার: কারণ-অনুমান, কার্য-অনুমান ও সামান্যদৃষ্ট অনুমান। সুধীর চক্রবর্তী এই বর্ণনা দিয়েছেন: কারণ-অনুমান ধোঁয়া দেখে আগুন বোঝা; কার্য-অনুমান গর্ভ দেখে মৈথুন বোঝা; ও সামান্যদৃষ্ট-অনুমান বিজ দেখে গাছের ফলানো বোঝা। যেকোনো কিছু নিয়ে অনেক দিকে বা স্তরে বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু বিশ্লেষণগুলো যদি কাজে না লাগায়, তাহলে এই কাজের কোন দাম নেই।

আমি এখানে ক্ষমাপ্রার্থী। শুরুতে বলেছি নিজের নামে দোহাই দিয়ে আমার অতি ব্যক্তিগত ধারণা পাঠকের সামনে উপস্থাপনা করব, তাতে আমারই নামে মাত্র ভুল-ভ্রান্তি ও কলঙ্ক থাকবে। পুরো দায়িত্ব নিজ হাতে রাখলাম আরকি। আসলে, মানুষ অনেক সীমাবদ্ধ। বাস্তব গ্রহণ করা ও বোঝার ক্ষমতা অনেক ক্ষীণ। তাই যতটুকু বুঝতে ও বোঝাতে পেরেছি এই প্রবন্ধে লিখার পর্যন্ত, কতটুকু সক্ষম না অক্ষম হয়েছি... সাঁইজির এই নিম্নে উল্লেখিত বাণী নিয়ে বিদায় নিলাম পাঠকের কাছ থেকে:

কি সাধনে পাই গো তারে,
যার নাম অধর এই সংসারে।
মুনি ঋষি হদ্দ হল ধ্যান ধরে॥

কেউ ফকির, কেউ হচ্ছে যোগী
কেউ মোহান্ত, কেউ বৈরাগী।
কারও বা কথায় মন
সুতায় দেয় গিরে॥

ব্রহ্মজ্ঞানী খ্রিষ্টানেরা
নাম-ব্রহ্ম সার বলেন তারা।
দরবেশ কয় বস্তু
কথায় দেখ না রে॥

গুরুতত্ত্ব বিধি শোনা যায়
তাও তো দেখি একরূপ সে নয়।
লালন বলে সে যা বুঝে তাই করে॥

জয়গুরু জয়গুরু॥

দেবোরাহ জান্নাত ॥ প্রাগপুর, জুলাই ১৩, ২০২১

১৬২২ ভাবনগর, জুন ২০২১

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

আবুল আহসান চৌধুরী (২০১৯), *লালনের ঈশ্বর ও অন্যান*", ঢাকা: জার্নিম্যান বুক্স

ওয়াকিল আহমদ (১৪২২ - ১৪০২), *লালন গীতি সমগ্র*, ঢাকা: বইপত্র

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার, *পাতঞ্জল দর্শন*, কলকাতা

সুধীর চক্রবর্তী *(২০১১)*, *ব্রাত্য লোকায়ত লালন*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী

English

Chaki, Lina (August 6, 2016), "The Empress of Baul Songs", Ekathara Kalari. ekatharakalari.com/nanibala-baishnabi-the-empress-of-baul-songs

Salomon, Carol, Keith E. Cantu, Saymon Zakaria (eds) (2017), *City of Mirrors, Songs of Lalon Sai*, UK: Oxford University Press

Sri Aurobindo (2001), *The Bhagavad Gita*, Pudducherry: Sri Aurobindo Divine Life Trust

French

Fella, Audrey (ed.) (2013), *Les Femmes Mystiques, Histoire et Dictionnaire,* Paris: Robert Laffont

Mazet, Francoise (1991), *Les Yoga-Sutras de Patanjali,* Paris: Albin Michel

Midal, Fabrice (2010), *Mandalas, Retrouver lÕunité du monde,* Paris: Seuil

[বি.দ্র.: এই লেখাতে উদ্ধৃত গানগুলোর অধিকাংশই আমার গুরু ফকির নহির শাহের মুখ থেকে পাওয়া।—দেবোরাহ জান্নাত]